ঘুড়ি

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

TOON TOON
BOOKS

আমার নাম ঘুড়ি। সবাই বলে ‘ঘুড়ি, খাও চিড়া গুড় মুড়ি।’ কিন্তু চিড়া, গুড় ও মুড়ি—তিনটাই আমার দুই চোখের বিষ। আমার ভালো লাগে চকোবার আইসক্রীম। সপ্তাহে একটার বেশি আমি তা খেতে পারি না। দাদা ভাইয়ের নির্দেশ।

আমার মায়ের নাম নাকি ছিল শেফালি। তিনি মারা যাওয়ার আগেই আমার নাম রেখে গেছিলেন ঘুড়ি। আমার দাদাভাই নাকি একটু আপত্তি করেছিলেন; কিন্তু আমার দাদি আমার ঘুড়ি নামটাই ফাইনাল করে ফেলেছিলেন। ফাইনাল করা মানে কোনো কিছু একদম ঠিক করে ফেলা। এরপরে আর কোনো কথা নেই। যাই হোক, শেফালি—মানে, আমার মা ছিলেন দাদিমার কলিজার টুকরা। আমাকে আমার দাদিমাই এটা বলেছেন। আমার মা নেই তো, এই জন্য আমার দাদিকে আমি দাদিমা বলে ডাকি। দাদি শুনলেই কেমন বুড়ি বুড়ি লাগে না? কিন্তু আমার দাদিমা একদম বুড়ি না। এখনো কুরবানির সময় পঞ্চাশ কেজির মাংসের পাতিল দুই হাতে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলতে পারে।

ও আচ্ছা, আমার নিজের কথা তো কিছু বলা হয়নি। আমি ঘুড়ি; আর আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। আমার সিক্সে পড়ার কথা ছিল; কিন্তু আমি ক্লাস ফাইভে অঙ্কে বত্রিশ পেয়েছিলাম। সব টিচাররা বলেছিল আমার দাদাভাইকে—একটা নম্বরই তো মাস্টারসাব, ওকে উঠিয়ে দিই; কিন্তু দাদাভাই এক কথার মানুষ আমাকে উঠাননি। সরি সরি, এটা তো বলা হয়নি আমার দাদাভাই আমার স্কুলেরই প্রিন্সিপাল। আমাদের গ্রামের নাম সুকুমার। স্কুলের নাম সুকুমার উচ্চ বিদ্যালয়।

ঘুড়ি

আমার বাবা, মানে শাহিন রুশদি থাকেন আমেরিকায়। সেখানে তার আরেকটা পরিবার। সেই পরিবারে আমার একটা বোনও আছে। বাবা প্রতিবার গরমকালে দেশে আসেন। আমার জন্য এত্ত এত্ত চকোলেট আনেন। অনেক অনেক জামাকাপড় আনেন। আর খুব সুন্দর সুন্দর বিদেশি বই আনেন। কী সুন্দর বইয়ের রং। বইয়ের পাতাগুলো চকচক করে। মনে হয় যেন পাতাগুলো কাগজের না, প্লাস্টিকের। আমি গ্রামের স্কুলে পড়লে কী হবে, আমি খুব ভালো ইংরেজি পারি। আমার দাদাভাই আমাকে শিখিয়েছে। ক্লাসে কোনো বন্ধু 'রেস্ট্রিকশন' শব্দটা উচ্চারণই করতে পারে না ঠিকমতো; কিন্তু আমি বানানসহ পারি। আর এই যে এত্ত এত্ত বই, এইগুলোও এখন আমি দাদাভাইয়ের সাহায্য ছাড়াই পড়ে ফেলতে পারি। আগে জোরে জোরে পড়তাম; কিন্তু ক্লাস ফাইভে ওঠার পর থেকে আর জোরে পড়ি না। বড়ো হয়েছি তো, এই জন্য।

আমি যে গতবছর ক্লাস ফাইভের অঙ্ক পরীক্ষায় ইচ্ছা করে ফেইল করেছি, এইটা না। এইটার একটা কারণ আছে। যদিও সেই কারণ মানতে কেউ তেমন রাজি না। ওহ গতবছর মানে হলো—আগের বছর। আর আগামী বছর মানে হলো পরের বছর। আগে আমি এই দুইটা শব্দ উলটাপালটা বলতাম; কিন্তু এখন পারি। পরিতোষ স্যার বেঞ্চের ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল বলেই মনে হয় আর ভুলিনি।

আচ্ছা যা-ই হোক, অঙ্কে বত্রিশ পাওয়ার ঘটনাটা বলি—

আমার সিট পড়েছিল একদম জানালার পাশে। যে জানালার পাশে দুটো বাবলাগাছ আছে, সেই জানালার পাশে। আমি চার নম্বর পর্যন্ত উত্তর দিয়েছি; এরপর হঠাৎ দেখি কি—একটি ছেলে স্কুলের মাঠের শেষ প্রান্তে যে একটা দেবদারুগাছ আছে, সেই গাছ বেয়ে তরতর করে উঠে গেল। হাতে একটা পাখির বাসা। গাছের একটা সুবিধাজনক জায়গায় সেই পাখির বাসাটা রেখে নামতে শুরু করল। এরপরে কী থেকে কী হয়ে গেল, আমি বুঝে ওঠার আগেই দেখি—ও চিতপটাং—আছাড় খেয়ে একেবারে ব্যাড়াছ্যাড়া হয়ে পড়ে যাওয়া।

সব ক্লাসে পরীক্ষা হচ্ছে। তাই মাঠেও তেমন কেউ ছিল না। আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখতে চাইলাম, কেউ এগিয়ে যায় কিনা; কিন্তু কাউকেই এগিয়ে আসতে দেখলাম না। ছেলেটা ওঠার চেষ্টা করল বার কয়েক; কিন্তু হাঁটু ধরে আবার বসে পড়ল। আমি বার বার জানালা দিয়ে তাকাচ্ছি। এ জন্য আবদুর রহমান স্যার আমাকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল—
রুশো শাহিন ঘুড়ি...

আমি চমকে তাকালাম, আমার আসল নাম ধরে কেউ সাধারণত ডাকে না। ডাকলে আমার কেমন জানি একটা অবাক লাগে।

-জি স্যার।

-তোকে পরীক্ষার হলে মাঠের দিকে তাকিয়ে গরুর রচনা লিখতে বলল কে রে?

আমি কিছু না বলে মাথা নিচু করে রইলাম। আড় চোখে গাছের নিচে পড়ে থাকা ছেলেটাকে দেখার চেষ্টা করছিলাম।

-অঙ্ক সব পারিস? দাদার মান-ইজ্জত থাকবে কিছু?

আমি আরও কিছুক্ষণ অঙ্কে মন দেওয়ার চেষ্টা করলাম; কিন্তু আমার মন পড়ে আছে মাঠে। ছেলেটাকে দূর থেকে মনে হলো—কাঁদছে। আমার কী যে মনে হলো, আমি এক মুহূর্তের মধ্যে স্যারের টেবিলে খাতাটা রেখেই ভোঁ দৌড় দিয়ে মাঠে চলে গেলাম। স্যার বোধ হয় আমাকে ডাকার চেষ্টা করছিল, আমি ঠিকমতো শুনতে পাইনি। শেষে স্যার হয়তো ভেবেছে—আমি কিছুই পারি না, তাই হাল ছেড়ে দিয়েছি।
আর সেই দিনই আমার সব থেকে প্রিয় বন্ধুর সাথে আমার পরিচয় হলো। গল্পটা খুব ইন্টারেস্টিং না?

আমি হন্তদন্ত করে ছেলেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওর দিকে একটু ঝুঁকে বললাম—

-এই ছেলে, বেশি ব্যথা পেয়েছ নাকি?

-তুমি কেমনে জানো?

আমি আঙুল দিয়ে জানালাটা দেখিয়ে বললাম,

-ওইখান দিয়ে দেখেছি।

ছেলেটা আমার দাদির পোষা বাছুরটার মতো তেজি তেজি ভাব দেখিয়ে ডলা দিয়ে হাঁটুর ব্যথা দূর করে ফেলার ভঙ্গি করল। আমি পায়ের তালুতে ভর দিয়ে ছেলেটার পাশে বসলাম।

-কী চাস? এইখানে বসে পড়লি কী কারণে?

ছেলেটা আচ্ছা বেয়াদব তো। কী রকম তুই-তোকারি করে কথা বলছে। আমি অবশ্য একটু রাগের মতো হলেও খুব একটা গায়ে মাখলাম না। ছেলেটা কেমন জানি খ্যাপাটে। আমার বেশ কৌতূহল হলো।

-আমার হাতটা ধরো দেখি। দেখে মনে হচ্ছে ভালোই ব্যথা পেয়েছ, একা একা উঠতে পারবে না।

আমি ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ছেলেটার তেজি তেজি ভাবটা একটু নরম হলো মনে হচ্ছে; কিন্তু এই ব্যাপারটা ও ঠিক বুঝতে দিতে চাচ্ছে না। উদাস হয়ে বাবলাগাছের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এরপর আমাকে বলল—

-এই, তোর নাম কী রে?

-ঘুড়ি।

ছেলেটা তার চারপাশে আকাশের দিকে তাকাল।

-এইখানে কোথায় ঘুড়ি দেখলি তুই?

আমার খুব হাসি পাচ্ছে। ওর ঘুড়ি খুঁজতে থাকা মুখটা দেখতে কী রকম জোকার জোকার মনে হচ্ছে।

-আমি হাসির মতো কী বললাম?

-আমার নাম ঘুড়ি।

-আমার সাথে ফাজলামো করিস?

-আমার নাম তো সত্যিই ঘুড়ি। ফাজলামো করব কেন?

-এইটা আবার কেমন নাম?

-এই নাম আমার মা রেখেছিল। নাম রেখে ঠুস করে মরে গেল।

আমার মা মারা যাওয়ার কথা আমি যে জনে জনে বলে বেড়াই—ব্যাপারটা মোটেই এরকম না। কেন যে আজকে বলে ফেললাম, এইটা আমি নিজেও ভালোভাবে জানি না। আমার মা নেই—এইটা জানলেই লোকেরা আমার দিকে করুণ চেহারা করে তাকায়। ওদের চেহারা দেখে আমার ওদের জন্যই উলটা মায়া লাগে; কিন্তু এই ছেলেটা খুব আজব। ও করুণ চেহারা করে তাকাল না, উলটা বলল,

-মা মারা যাওয়া খারাপ কিছু না, ভালোই ব্যাপার। পাগল মায়ের চেয়ে মরা মা ভালো; কী বলিস?

ছেলেটার মাথায় ছিট জাতীয় কিছু আছে কিনা, কে জানে। পাগল মা, মরা মা—এইসব কী জাতীয় কথা, কে জানে। মা তো মা-ই; সে পাগলই হোক আর মরাই হোক।

ছেলেটা এইবার নিজ থেকেই হাত বাড়িয়ে দিলো—

-এই আমাকে টেনে তোল দেখি। পারবি, নাকি আবার ফেলে দিবি? দেখে তো মনে হচ্ছে গায়ে কোনো শক্তিটক্তি নাই। আর শোন ঘুড়ি, আমার নাম 'বগাভাই'।

-তোর নাম বগা?

-না, বগাভাই। আমার নামই বগাভাই।

-জীবনেও বিশ্বাস করি না। বগা, তা-ও মেনে নেওয়া যায়, ভাই আবার কী?

-এই নাম আমি নিজেই দিয়েছি। সবাই আমাকে বগাভাই নামেই ডাকে। চিন্নু, শুক্কু আর টিপু সুলতান—এই নামেই আমাকে ডাকে। পাড়ার দোকানদার রতন মিয়াও এই নামে ডাকে।

-ও আচ্ছা। তোমার বাড়ি কোথায়? চলো, তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই।

-তোরা বন্ধুরা নিজেদের 'তুমি' করে বলিস বুঝি?

-না তো, 'তুই'ও বলি।

-তবে 'তুমি' 'তুমি' করছিস কেন?
-তুমি কি আমার বন্ধু?
-বন্ধু না তো কী?

বগাভাই রাগ রাগ চোখে আমার দিকে তাকাল। ওর রাগী চোখ দেখে আমার কেন জানি ভয়ের বদলে হাসি চলে এলো। আমি ফিক করে একটুখানি হেসেও ফেললাম। বগাভাই আমার হাসি দেখে চোখ পাকিয়ে তাকাল; কিন্তু কিছু বলল না।

-এই পাখির বাসাসহ বাচ্চা পাখি তিনদিন আগে পড়ে গেছিল, জানিস। চিউ চিউ করে ডাকছিল। আমি সন্ধ্যায় দেওয়াল টপকে স্কুলের মাঠে এসেছিলাম চুন্নু, শুক্কু আর টিপুকে নিয়ে; তখন দেখেছি। তারপর বাসাসহই পাখি দুইটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। অল্প একটু ডানা ভেঙে গিয়েছিল একটা পাখির। হলুদের মলম লাগিয়ে দিয়েছি। আস্তে আস্তে সেরে উঠল। তাই আজকে ফেরত দিয়ে গেলাম। ওদের মা নিশ্চয় ওদেরকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। আমার মা সারাদিন আমাকে ডাকে তো—বগা, বগারে, ওই বগা, বগা নোয়ারটা কই গেল রে। পাগল মানুষ তো। মাথা ঠিক নেই।

বগাভাই এক নিঃশ্বাসে কথা বলছে। আমার খুবই ভালো লাগছে শুনতে। ওর চোখগুলো বড়ো বড়ো। কেমন যেন গোল গোল। মানুষের চোখ চ্যাপ্টা হয়; কিন্তু বগা ভাইয়ের চোখ কী কারণে জানি গোল গোল। কথা বলার সময় আরও বেশি গোল গোল দেখায়। আমাদের বাড়ি পার হয়ে পনেরো মিনিট হাঁটলেই বগা ভাইয়ের বাড়ি। আমার কাঁধে ভর দিয়েই পুরো রাস্তা হেঁটে গেল ও।

বগা ভাইয়ের মা পাগল। এই কথাটা শোনার কারণে নাকি কে জানে, আমি ধরেই নিয়েছিলাম—ওর বাড়িঘর হবে ভাঙাচোরা, এলোমেলো। কিন্তু কী আজব ব্যাপার, ছিমছাম একটা টিনের ঘর। পরিপাটি করে

সাজানো গোছানো। একটা বড়ো বারান্দা। তার মধ্যে আবার নানান রকমের পাতাবাহারের গাছ। গ্রামের বাড়িগুলোতে সাধারণত বারান্দায় পাতাবাহারের গাছ টবে লাগানো এরকম দেখা যায় না। আমি যখন দাদা ভাইয়ের সাথে ঢাকা যাই বই কিনতে, তখন এরকম বাসাবাড়িতে বন্দি থাকা গাছপালা দেখি। আমার বন্দি গাছেদের জন্য মন কেমন করতে থাকে; কিন্তু বগা ভাইয়ের বারান্দায় এদের দেখে আমার বেশ ভালোই লাগল। মনে হচ্ছে—ওরা হাসতে হাসতে বারান্দায় বেড়াতে এসেছে।

উঠোনটাতে দুইটা আমগাছ পাশাপাশি, একটু দূরে একটা ঝাঁকড়া বরইগাছ। আবার একটা কাঁধ বাঁকা করে দাঁড়ানো পেয়ারা গাছও আছে। সেখানে অনেক পেয়ারা দেখা যাচ্ছে। আমার দেখেই লোভ লাগল। গাছের দিকে তাকাতেই একটা কাঠবিড়ালী দৌড়ে পালিয়ে গেল; দেখে মনে হলো—আমার দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটল।

-এইটা আমার পোষা কাঠবিড়ালী।

-এহ, তুই তো ভীষণ গুলবাজ আছিস দেখছি। কাঠবিড়ালী পোষ মানে নাকি?

-তা আমি জানি না; কিন্তু এইটা আমার পোষা কাঠবিড়ালী। এর নাম মমতাজ।

-ছেহ, কী বিচ্ছিরি লাগছে শুনতে। কাঠবিড়ালীর নাম নাকি মমতাজ। কথার কি ছিরি। যা ভাগ।

তোর সাথে বন্ধুত্ব করা বিরাট ভুল হয়ে গেছে দেখছি। তুই আমাকে অযথাই গুলবাজ বলছিস; আবার আমার পোষা কাঠবিড়ালীর নাম নিয়ে ফাজলামো করছিস।

-আচ্ছা যা, আর করব না। তোর কাঠবিড়ালীর নাম মোছাম্মাৎ মমতাজ খাতুন। আচ্ছা, তোদের উঠোন এত পরিষ্কার, একটা পাতাও নেই। কে ঝাঁট দেয়?

কাঠবিড়ালীর নাম মোছাম্মাৎ মমতাজ খাতুন বলেছি বলে বগাভাই মুঠি পাকিয়ে আমাকে মারতে আসলেও শেষ পর্যন্ত হাঁটু ব্যথার কারণে বোধ হয় সেই ইচ্ছা বাদ দিলো।

-আমার বাবা ঝাঁট দেয়। মাঝেমধ্যে আমিও দিই।

-কী বলিস?

-এত অবাক হওয়ার কী আছে? আমার বাবার মতো মানুষ এই গ্রামে আর একটাও নাই।

-তোর বাবা কী করে?

-ওই যে মসজিদটা দেখতে পাচ্ছিস, সেইখানের ইমাম। নামাজ পড়ান, জুম্মার নামাজও পড়ান। ভোরবেলা ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মসজিদের বারান্দায় বসিয়ে কুরআন পড়া শেখান। আবার মাঝেমধ্যে ওদের চকোলেটও দেন।

-বাহ, মজা তো।

-বাবা বাসাতেই আছেন। একটু পরে নামাজ পড়াতে চলে যাবেন। বাবা কী করছেন, জানিস? রান্না করছেন। মা পাগল মানুষ তো, রান্না করতে পারেন না; নিজের খাবারও নিজে খেতে পারেন না। বাবা খাইয়ে দেন। মা খুব জ্বালাতন করলেও বাবা কখনো তাকে বকেন না। মাঝে মধ্যে বলেন, 'রেহানা, অবুঝের মতো কইরো না তো, কথা শুইনো আমার।' মা তখন সত্যি সত্যি ঠান্ডা হয়ে যান।

এইসব কথার জবাব কী দিতে হয়, আমি জানি না। তাই চুপ করে রইলাম। একটু পরে বগা ভাইয়ের বাবা বের হয়ে উঠোনে এলেন। দাড়িতে মানুষকে এত সুন্দর লাগে—বগা ভাইয়ের বাবাকে না দেখলে আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করতাম না। আমার দাদা ভাইয়ের দাড়ির রং মিরিন্ডা কালারের। আমার আপন-আপনই লাগে; কিন্তু এত সুন্দরও লাগে না। বগা ভাইয়ের বাবা মানুষটা কী সুন্দর! এত লম্বা, কেমন তামাটে ফরসা গায়ের রং, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, কেমন উদাস উদাস লাগে দেখতে। সুন্দর মানুষের কণ্ঠ

নাকি মিনমিনে হয়; কিন্তু কী আজব ব্যাপার, তার কণ্ঠ একেবারে মেঘের মতো গম্ভীর। আমাকে দেখেই বলল—

-তুমি নাজাতের নতুন বন্ধু বুঝি?

-জি, আজকেই পরিচয় হয়েছে। ও হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে তো, তাই বাসা পর্যন্ত নিয়ে এসেছি।

বগাভাই ব্যথা পেয়েছে শুনে ওর বাবার মধ্যে কোনো টেনশনই দেখা গেল না। বোঝাই যাচ্ছে—এইসব ওর নিত্যনৈমিত্তিক কাণ্ড। ওর বাবা উলটা আমাকে বলল—

-এসেছ যখন ভালোই হয়েছে। দুপুরে এখানে খেয়ে যাবে। আজকে অনেকদিন পর ইলিশ মাছ ভাজি করেছি। কাঁটা বেছে খেতে পার তো?

-জি চাচা, পারি।

-ওহ তোমার নাম কী, তাই তো জানা হলো না।

-আমার নাম ঘুড়ি।

-তোমার নাম ঘুড়ি? তুমি কি শেফালির ছেলে? তোমার বাবা তো দেশের বাইরে থাকেন, তাই না?

অনেক দিন পর কারও মুখে মায়ের নাম শুনে আমার খুবই অবাক লাগল। আমি কৌতূহল চেপে রেখে বললাম—

-জি চাচা, আমার মায়ের নাম শেফালি। তিনি তো...

আমার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি বললেন—

-জানি তো, তোমার মা মারা গেছেন।

আমি চুপ করে রইলাম। এই বিষয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না।

-তোমার মা আর রেহানা, মানে—নাজাতের মা, দুজনে প্রাণের বান্ধবী ছিল। এ জন্য তোমার নাম সবার আগে রেহানা জানতে পেরেছিল। তাই আমিও।

আমার হঠাৎ করেই বগা ভাইয়ের মাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো—ওর মাকে দেখলে আমার মাকেও একটু দেখা হয়ে যাবে। আর বগা ভাই যে একটা গুলবাজ, এই ব্যাপারে আমি এখন নিশ্চিত। এত সুন্দর একটা নাম ওর; অথচ আমাকে বলল—ওর নাম নাকি বগাভাই।

চাচা আবার রান্নাঘরের দিকে যেতেই আমি বগা ভাইকে বললাম—

-এইবার তো স্বীকার করবি, তুই একটা গুলবাজ। মানুষ নিজের নাম নিয়েও গুলবাজি করে বুঝি।

-আমি কোনোই গুলবাজি করিনি। তোর একটা পুরা নাম নেই? আছে কিনা বল। তোর নাম কি শুধুই ঘুড়ি?

আমি ভেবে দেখলাম—আমার তো একটা পুরো নাম আছে বটে।

-আছে তো। রুশো শাহিন।

-তোকে যখন তোর নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুই কি বলেছিলি ‘আমার নাম রুশো শাহিন’?

-তা বলিনি।

-তবে? আমিও বলিনি আমার নাম নাজাত আবদুল্লাহ। আমার মা আমার নাম রেখেছে বগা। আমার গলা নাকি জন্মের পর অনেক লম্বা ছিল, তাই বগা। ভাই শব্দটা আমি যোগ করেছি পরে; কিন্তু এইটাই এখন আমার নাম। আমার জন্মের পর থেকেই নাকি মা কেমন একটু পাগলাটে হয়ে গেল। কেন—তা কেউ জানে না। সবাই বলে বাতাস লেগেছে। বদ জিন গায়ে ভর করেছে। আর ছেড়ে যায়নি।

আমি বগা ভাইয়ের নামের অকাট্য যুক্তি ফেলতে পারলাম না।

ইলিশ মাছ ভাজি আর ডাল; কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল এত মজার খাবার আমি জীবনেও খাইনি। আমার দাদিমার হাতের রান্নাও খুব মজা; কিন্তু বগা ভাইয়ের বাবার ব্যাপারটা একদম আলাদা।

বগাভাই নিজেই পা টেনে টেনে চলাফেরা করতে শুরু করল দুই-এক ঘণ্টার মধ্যেই। ব্যথাটা বোধ হয় বাড়াবাড়ি পর্যায়ের কিছু না।

খাওয়া শেষে আমি আর বগাভাই ওদের বাড়ির পেছনের ঘাটলার পাশে বসলাম। মসজিদের লোকেরা এখান থেকেই ওজু করে। কয়েক জায়গায় সিঁড়ির মতো তৈরি করা আছে। জায়গাটাতে একটা মন খারাপ করা ব্যাপার স্যাপার আছে নিশ্চয়। আমার মন কেন জানি খারাপ খারাপ করতে লাগল; যদিও আমি তেমন একটা সুযোগ পেলাম না বগা ভাইয়ের নানান গাঁজাখুরি গল্পের যন্ত্রণায়। যেমন: মমতাজ নামের কাঠবিড়ালী তাকে পেয়ারা পেড়ে খাওয়ায়। মমতাজ বলে ডাকলেই চলে আসে। আবার শ্মশানের পাশে যে খন্দকার বাড়ি আছে, সেখান থেকে প্রায়ই ল্যাদা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়া যায়; কিন্তু সেখানে কোনো বাচ্চা থাকার কোনো কারণ নেই। এইটা নাকি একটা রহস্য। এই রহস্য বগাভাই আর তার বাহিনী দ্রুত উদ্ধার করে ফেলবে। বগা ভাইয়ের বাহিনী মানে হলো চিন্নু, শুক্কু আর টিপু সুলতান। আমি চাইলেই এই রহস্য উদ্ধারে তাদের সাথে যোগদান করতে পারি।